মহাতীর্থ বদ্রিকাশ্রম

'পবননন্দ সুগন্ধ শীতল হেম মন্দির শোভিতম্।
শ্রীনিকট গঙ্গা বহত নির্মল শ্রীবদ্রীনাথ বিশ্বম্ভরম্।।'—
(শ্রীশ্রীবদ্রীনারায়ণস্যাত্রিকম্)

এই ভুবনমোহিনী তুষারকিরীটিনী বদরীকাশ্রম অতি পবিত্র ও ত্রিলোকের মধ্যে দুর্লভতম তীর্থ।

স্কন্দ পুরাণের বিষ্ণু খণ্ডে এই তীর্থ মাহাত্ম্য বর্ণনায় আমরা পাই যে এই তীর্থের নাম কেবলমাত্র স্মরণমাত্রই মহাপাতক মানবও পাপমুক্ত হয়। তার মৃত্যুভয় দূর হয়ে সে মুক্তিভাগী হয়। —

'ক্ষেত্রস্য স্মরণাদেব মহাপাতকিনো নরাঃ।
বিমুক্ত কিল্মিষাঃ সদ্যো মরণান্মুক্তিভাগিনঃ।।'

অন্য তীর্থে কঠোর তপস্যার যে ফল, মনে মনে বদরীতীর্থের চিন্তা করলেও তার সমতুল ফল লাভ হয়। স্বর্গ-মর্ত্য পাতালে বহু তীর্থ আছে, কিন্তু বদরী তুল্য তীর্থ নেই আর ভবিষ্যতেও হবে না কারণ 'বদরীং ভগবান্ বিষ্ণুর্ন মুঞ্চতি কদাচন'— অর্থাৎ শ্রীহরি এই বদরীতীর্থ কদাচ পরিত্যাগ করেন না।

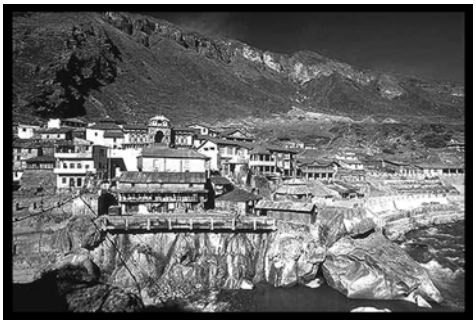
মহাতীর্থ বদরীক্ষেত্র

প্রাচীনকালের এই শ্রেষ্ঠ তীর্থকে বহু ঋষি, মুনি ও মহাত্মা 'ভূ-বৈকুণ্ঠ' বা 'তপোবন' বলে অভিহিত করেছেন। পৌরাণিক যুগে এই উপত্যকাকে দেবতাদের বিচরণ ভূমি বলে গণ্য করা হত। এই দেবভূমি যুগে যুগে বিভিন্ন নামে পরিচিত। সত্যযুগে এই স্থানের নাম ছিল 'মুক্তিদা', ত্রেতায় 'যোগসিদ্ধিপ্রদা', দ্বাপরে-'বিশালা' আর কলিযুগে-'বদরী'। কলিযুগের বদরীনারায়ণ নামকরণের পিছনে যে পৌরাণিক কাহিনী বর্তমান তা হল — একসময় স্বয়ং নারায়ণ এই স্থানে অলকানন্দা নদী তীরে বদরীবৃক্ষ অর্থাৎ কুলগাছের নীচে বসে তপস্যা করেছিলেন; সেই থেকে এই স্থান 'বদরীনারায়ণ' নামে বিখ্যাত। পুরাকালে সতীর বিরহে কাতর হয়ে স্বয়ং ভোলানাথ এই স্থানে (বর্তমানে বিরহীগঙ্গা) ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন। পরমপুণ্যধাম ভূবৈকুণ্ঠ বদরীক্ষেত্র হল মন্দাকিনী ও অলকানন্দার মিলনক্ষেত্র। ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব এই স্থানেই শিবের তপস্যায় রত ছিলেন এবং বশিষ্ঠেশ্বর মহাদেব তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। তুষারধবল নর ও নারায়ণ পর্বত অতীত যুগের নর ও নারায়ণ ঋষির তপস্যার স্মৃতি বহন করে আজও স্বমহিমায় উন্নত শিরে এস্থানে দণ্ডায়মান।

শিবাবতার আদি শঙ্করাচার্য্য দৈবাদিষ্ট হয়ে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করার উপযুক্ত স্থান বলে বদরীক্ষেত্রকেই মনোনীত করেছিলেন। বহু দুর্গম পথ ও শত বাধা অতিক্রম করে সশিষ্য শঙ্কর উপস্থিত হয়েছিলেন বদরীক্ষেত্রে। মন্দির সংলগ্ন তপ্তকুণ্ডে স্নান করে বদরীবিশালজীর মন্দিরে গিয়ে তিনি দেখেন সত্যযুগে প্রতিষ্ঠিত নারায়ণের মূর্তির বদলে সেখানে শালগ্রাম-শিলায় শ্রীভগবানের পূজা হচ্ছে। শঙ্কর পূজারীদের প্রশ্ন করে জানতে পারলেন যে চীনা দস্যুদের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য তাঁদের পূর্বপুরুষগণ নিকটবর্তী কোন কুণ্ডমধ্যে শ্রীবিগ্রহকে গোপনে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু পরে চেষ্টা করেও সেই বিগ্রহ আর উদ্ধার করা যায় নি। সেই থেকে শালগ্রাম-শিলায় পূজার্চনা চলে আসছে। এই কথা শুনে আচার্য্য ধ্যানমগ্ন হলেন, ধ্যানভঙ্গের পর তিনি পূজারীদের জিজ্ঞাসা করলেন যে সেই প্রাচীন বিগ্রহ উদ্ধার হলে তাঁরা সেই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে পূজা করতে প্রস্তুত কিনা। পূজারীদের সমবেত সম্মতি ও অসীম আগ্রহ দেখে আচার্য্য শঙ্কর তখন ধীরে ধীরে নারদকুণ্ডের দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁকে অনুসরণ করে চলল শিষ্যগণ ও পূজারীবৃন্দ। কুণ্ডের ধারে এসে তিনি কুণ্ডের মধ্যে নামবার উপক্রম করলে পূজারীরা সমস্বরে তাঁকে বাধা দেন ও উঠে আসতে বলেন। তাঁরা বিচলিত ভাবে আচার্য্যকে জানান যে কুণ্ডের সাথে অলকানন্দার সংযোগ আছে, তাই সেই অন্তঃস্রোতের মধ্যে পড়লে তাঁর প্রাণসংশয় হতে পারে। এমনি করে বহু লোকের প্রাণহানি সেখানে হয়েছে। কিন্তু শঙ্কর কারও কথায় কর্ণপাত না করে কুণ্ডের জলে ডুব দিলেন ও একটু পরে উঠে এলেন একটি চতুর্ভুজ নারায়ণ বিগ্রহ হাতে নিয়ে। বিগ্রহটি পর্য্যবেক্ষণে দেখা গেল যে দক্ষিণ হাতের কয়েকটি আঙুল ভেঙে যাওয়ায় বিগ্রহটির অঙ্গহানি হয়েছে। তখন তিনি সেই মূর্তিটিকে অলকানন্দার জলে বিসর্জন দিয়ে

আবার কুণ্ডমধ্যে প্রবেশ করলেন এবং আবারও একটি নারায়ণ মূর্তি হাতে করে উঠে এলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই মূর্তিটিও আগের ভগ্ন মূর্তিটির অনুরূপ। দ্বিতীয় মূর্তিটিকেও নদীস্রোতে বিসর্জন দিয়ে তিনি তৃতীয়বার নামলেন কুণ্ডের জলে এবং উঠে এলেন অনুরূপ একটি ভগ্ন মূর্তি হাতে। স্তম্ভিত শঙ্কর তখন ভাবতে লাগলেন —এ কি করে সম্ভব হয়? এ কি কোন দৈবী মায়া! সেই সময় তিনি দৈববাণী শুনতে পান যে 'কলিতে এই ভগ্ন বিগ্রহেই পূজা হবে'। সেই দৈববাণী শুনে শঙ্কর আশ্বস্ত হলেন এবং স্বয়ং মন্দিরে শ্রীনারায়ণ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করলেন। পরবর্তীকালের পূজা-অর্চনা ও সেবার দায়িত্ব তাঁরই অনুগামী এক যোগ্য নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণের উপর ন্যস্ত করলেন।

এই কালো পাথরের বিগ্রহটি শালগ্রাম শিলা হতেই নির্মিত। যোগাসন বা সিদ্ধাসনে উপবেশিত। মাথার উপরিভাগ থেকে জটাভার নেমে এসেছে কাঁধের উপর। বুকের উপর উপবীত ও হৃদয়ে ভৃগুপদ চিহ্ন। শান্ত সমাহিত যোগী মূর্তি। শিবক্ষেত্র হিমালয়ে সর্বত্র শিব অধিষ্ঠিত একমাত্র বদ্রী মন্দির তার ব্যতিক্রম; এখানে নারায়ণই আরাধ্য দেবতা। রাজা যুধিষ্ঠির বিরচিত স্তোত্রেও তা পরিস্ফুট—

কৈলাসমে একদেব নিরঞ্জন শৈল শিখর মহেশ্বরম্।
রাজা যুধিষ্ঠির করত জয় জয় শ্রীবদ্রীনাথ বিশ্বম্ভরম্।।

(শ্রীশ্রীবদ্রীনারায়ণস্যাত্রিকম্)

পরবর্তীকালে এই বদরীক্ষেত্রে শ্রীশঙ্করাচার্য্য জ্যোতির্মঠ নামে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন বর্তমানে যার নাম যোশীমঠ। অথর্ববেদের প্রতীক এই মঠ বদরীনারায়ণ থেকে কিছু দূরে অবস্থিত। এখানের প্রথম অধ্যক্ষ হিসাবে শঙ্করাচার্য্য তাঁর চতুর্থ পট্টশিষ্য তোটকাচার্য্যকে নিযুক্ত করেন। শঙ্করাচার্য্যের জ্যোতির্ম্মঠাম্নায়ঃ স্তোত্রে আমরা পাই —

'বদরীশাশ্রমঃ ক্ষেত্রং দেবো নারায়ণঃ স্মৃতঃ
পূর্ণাগিরি চ দেবী স্যাদাচার্য্যস্তোটকঃ স্মৃতঃ।'(৩)

অর্থাৎ, ক্ষেত্র বদরীনারায়ণ ধাম, দেবতা স্বয়ং বদরীনারায়ণ, দেবী পূর্ণাগিরি, (প্রথম) আচার্য্য তোটক।

শ্রীবদরীনারায়ণ বিগ্রহ

শোনা যায় কালান্তরে এই স্থান মানুষের অগম্য হয়ে যাবে এবং তখন ভবিষ্য বদরী নামক স্থানে শ্রীনারায়ণ বিরাজ করবেন । পরম পুণ্য এই দেবস্থানে দেবতা সদা জাগ্রত তাঁর পূজা কোনো অবস্থাতেই বন্ধ হবার নয়।

(সহায়ক গ্রন্থ: স্কন্দ পুরাণ ও শঙ্করাচার্য্যের জীবনী গ্রন্থাদি)

—মাতৃচরণাশ্রিতা ব্রহ্মচারিণী কেয়া

তোমার আলো

তোমার আলোয় ভরিয়ে দিলে আমার হৃদয়
সেই আলোকের আলোকমালায় আমার হৃদয় শান্তিময়।
লতায় পাতায় বনবিতানে কাকলি কূজনে, তটিনীর গানে
কত সুরে সুরে কত কলতানে
তোমার চিন্ময় রূপ জগৎমাঝারে
আনে আনন্দ গান।

প্রকৃতির বুকে ফুলের মেলায় কত বিচিত্র আলোর খেলায়
রঙের বাহারে রঙে রঙে মিলে
তোমার রূপ এ-বিশ্বে প্রকাশমান
সুখ দুঃখ হাসি কান্না এই পৃথিবীর যত বেদনা
আলোর পরশে জাগালো চেতনা
দূর হয়ে গেল সকল যাতনা
করি আনন্দধারা স্নান।

সকল আঁধার দূরে সরে যাক ঘুচে যাক সব কালো
তোমার আশীষ ভরুক ভুবনে
ঝরুক তোমার জ্যোতির আলো
দাও আলো আরো আলো।

—শ্রীমতী সুনন্দা মুখার্জী